Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-I, October 2020, Page No.44-51
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের নির্বাচিত ছোটগল্প : অসমে বঞ্চিত বাঙালির ক্রন্দন

অশ্বিনী শর্মা
গবেষক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract:

Jyotirmay Sengupta is a familiar name in the institutional range Assam's cultivation of literature and culture. Many books of this talented author have already been published. This creative author has another identity i.e short story writer. Literature is the mirror of society. So it is needless to say what happens to the society is reflected on the literature. It is known to all that the Bengalees of Assam are exploited and deprived of various sides in the backdrop of recent time. On the other hand, 'Drive away Bengalee' movement in Assam has made the life of the bengalees intolerable. Jyotirmay Sengupta is a responsible and talented author. So this dilapidation of the society has hurt the author like a heated iron-needle. He has beautifully unfolded the rights, exploitation, deprivation and oppression of the Bengalees in Assam in the stories of his story book 'Shikharer Nathipatra'. This theme will be discussed in detail in the main article.

Key Words: Jyotirmay Sengupta, short stories, Assam, Bengalees, Existence, Crisis.

জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত অসমের বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার বিদ্যায়তনিক পরিসরের এক পরিচিত নাম। এই প্রতিভাবান লেখকের বেশ কিছু গ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' (প্রবন্ধ সংগ্রহ) 'ফেল নিরোধক পিল' (ব্যঙ্গ রচনা) 'অসমের বাংলা লিটল ম্যাগাজিন: ছোটগল্প চর্চার প্রেক্ষাপট ও ক্রমবিকাশ', 'আয়লো গুটি যায়লো গুটি'(অসমীয়া ছড়ার অনুবাদ), 'নারীর কলমে নারী' প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রভৃতি। সৃজনশীল এই লেখকের আরও একটি উল্লেখযোগ্য পরিচয় তিনি ছোটগল্পকার। আত্মপ্রচারে অনুৎসাহী এই গল্পকার অনেকটা কৃপণ স্বভাবের এবং লেখেনও অনেক কম। বলাবাহুল্য অসমে বাংলা গল্প যাঁরা লেখেন তাঁদের প্রায় সকলই এরকম কিপ্টে স্বভাবের। এই গল্পকার বিভিন্ন ছোটকাগজে গল্প লিখেছেন, কিছু কাগজ প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে; লেখকের কপিটিও হয়তো কোনো পাঠকের কাছে হস্তান্তরিত—অসমের বাংলা গল্পকারদের অনেকেরই প্রায় এমন অবস্থা। জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের এমনই হারিয়ে যাওয়া এবং ছোট পত্রিকায় প্রকাশিত পনেরটি গল্প নিয়ে অসমের আর এক গল্পকার কান্তার ভূষণ নন্দী 'যাপনকথা'-য় প্রকাশ করেন 'শিকড়ের নথিপত্র' গল্পগ্রন্থটি। জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত একজন দায়িত্বশীল, প্রতিভাবান লেখক। তাঁর গল্পভুবনে সমকালীন সমাজ ও সময় অধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। আধুনিক সময়ের প্রেক্ষাপটে অসমের বাঙালিদের সংকট ও হতাশার ছবি লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। এইসব ঘটনা লেখককে তপ্ত লৌহ শলাকার মতো বিদ্ধ করেছে যা উঠে এসেছে তাঁর বিভিন্ন গল্পে।

অসমের বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষা আন্দোলন ছিল অসম সরকারের অসমীয়া ভাষাই রাজ্যের একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কারণ ওই অঞ্চলের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল বাংলাভাষী। এই গণ আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে ১৯৬১ সালের ১৯শে মে। সেদিন ১১ জন প্রতিবাদীকে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে অসম পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—কানাইলাল নিয়োগী, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, হিতেশ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্র কুমার দেব, কুমুদ রঞ্জন দাস, সুনীল সরকার, তরণী দেবনাথ, শচীন্দ্র চন্দ্র পাল, বিরেন্দ্র সূত্রধর, সুকোমল পুরকায়স্থ এবং কমলা ভট্টাচার্য। এছাড়াও অসমে বাংলা ভাষার জন্য ১৯৭২ সালের ১৭-ই আগস্ট বিজন চক্রবর্তী নামে আরও একজন শহীদ হন। ১৯৮৬ সালের ২১ শে জুলাই প্রাণদান করেন জগন্ময় দেব এবং দিব্যেন্দু দাস নামে আরও দুজন। অসমের বাংলা ভাষা এবং বাঙালিদের আত্মদান ও আত্মত্যাগের কথা বলতে গিয়ে ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী একটি বক্তৃতায় বলেছেন, "বাংলাদেশের বাঙালিদের কাছে বাংলা ভাষা একটি আবেগ। কিন্তু অসমের বাঙালিদের বাংলা ভাষার প্রতিটি বর্ণে রক্ত লেগে আছে। কারণ এখানে বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছিল।"[১] অসমে বাংলা ভাষা আন্দোলনের চার যুগের প্রায় বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু আজও অসমে বাঙালিদের কখনো বহিরাগত বাংলাদেশী বলে, কখনো 'এন.আর.সি'র নামে, কখনো বা 'ডি.ভোটার'-এর নামে নানা রকম শোষণ, বঞ্চনার শিকার হতে হয়। আবার কখনো অসমে বাঙালি খেদাও আন্দোলনের বলি হতে হয় অনেক নিরীহ বাঙালিকে। এ প্রসঙ্গে ড. দেবাশীষ ভট্টাচার্য 'শিকড়ের নথিপত্র' গল্পগ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন, "জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের গল্পভুবনে অসমের বাঙালি জীবনের স্বপ্ন-আশার নির্মাণ ও ধ্বংসের, প্রতিবেশী গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত জীবন-যাপনের এবং আইডেন্টিটি সংকটের বিষয়টিই প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে।"[২] আলোচ্য গবেষণা নিবন্ধে অসমের বাঙালিদের মানসিক যন্ত্রণা, সংকট ও হতাশার চিত্রটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে, আলোচনা করা হবে 'শিকড়ের নথিপত্র' গল্পগ্রন্থের নির্বাচিত কিছু গল্প।

'ক্রসিংগেট' গল্পটি উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা অসমের বাঙালি জীবনের সংকটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। গল্পের মূল চরিত্র দিব্যাংশু। বংশবৃক্ষ নথি যাচাইকরণের জটিলতায় ফেঁসে যায় দিব্যাংশু। শুধু দিব্যাংশু নয়, দিব্যাংশুর মতো অসমের সহস্রাধিক বাঙালি। দিব্যাংশু অসমের নাগরিত্বের অধিকার পেলেও তার স্ত্রীর নথি যাচাইকরন বাকি রয়ে যায়। কিন্তু সার্কেল অফিসে যাওয়ার পথে রেলওয়ে ক্রসিং গেটের সামনে ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়ে সে। বাসের ভেতরে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় থাকা দিব্যাংশু পর্যবেক্ষণ করে মালসা নামে এক পাগলের আজগুবি কীর্তিকলাপ। তীব্র যানজটে বিপর্যস্ত মানুষজন মালসাকে খেপিয়ে মজা দেখছে। মালসাও সহ্য করতে না পেরে গালাগাল শুরু করে, তবে এর প্রতিদানে তাকে চড়, ঘুষি, কিল খেতে হয়। গল্পকারের ভাষায়, "শুধু কখনো কখনো হুঙ্কারে থেমে না গেলে মালসা যখন ওই মজা লুটনে ওয়ালা দোকানিদের বাপ-মা তুলে গালাগাল দেয় তখন অবশ্য চড়টা-ঘুষিটা-কিলটা খেতে হয়।"[৩] দিব্যাংশু মাঝে মাঝে অন্যত্রও দেখেছে এই মালসাকে—কখনো বড় বাজারের শিব মন্দিরে ঢুকতে ফুটপাতে খিচুড়ি প্রসাদের লাইনে, আবার কখনো অন্নপূর্না হোটেলের বিপরীতে ডাস্টবিনের আড়ালে। তবে এই দুটি পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। লেখক এই পার্থক্য দেখাতে গিয়ে বলেছেন, "শিব মন্দিরের ফুটপাতে তার কাজ শুধু গোগ্রাসে গরম খিচুড়ি গেলা, আর ডাস্টবিনের আড়ালে বসে পড়ার আগে তাকে কষ্ট করে কুড়িয়ে নিতে হয় ডাঁই করা উচ্ছিষ্ট থেকে।"[৪] ক্রসিং গেটের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে কেন্দ্র করেই দিব্যাংশুর মনে পড়ে যায় কৈশরের সেই স্মৃতির কথা। এই মালসার প্রকৃত নাম দিব্যাংশু, তার বন্ধু-বান্ধব এমনকি বড়রাও জানতেন না। এই মালসা সামান্য মুড়ি কিংবা দশ-পাঁচ টাকার জন্য মানুষের যেকোন কাজ করে দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতো। লেখকের ভাষায়, "বাগান

পরিস্কার, বেড়া দেওয়া, মুদির দোকান থেকে মাসের বাজার আনা, কেউ বাইরে বেড়াতে গেলে রাতে ঘর পাহারা দেওয়া, স্টেশনে বেডিং বাক্স পৌঁছে দেওয়া, নিয়ে আসা ইত্যাদি সব কে করবে? না মালসাকে ডাকো।"[৫] দিব্যাংশুর মনে পড়ে, ক্রসিং গেট থেকে একটু এগিয়ে ইঞ্জিন সেডের দেওয়াল যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান দিয়ে বড় বাজারে যাওয়ার একটি শর্টকার্ট রাস্তা ছিল। আর শীতকালে যখন মজা পুকুরটি শুকিয়ে যেত, তখন পাকা রাস্তা ছেড়ে লাইনে ওঠার আর একটি রাস্তা তৈরি হতো একটি বাঁক নিয়ে। এই বাঁকের মুখে একটি চাতাল বটগাছ ছিল এবং নীচে ছিল লাল কাপড় জড়ানো ছোট্ট ত্রিশূল। মানুষের বিশ্বাস এখানে লালবাবা বাস করেন। রাতে তো দূরের কথা, দিনের বেলা এই জায়গা পার হতে মানুষের হাড় হিম হয়ে যেত। এর কিছুটা দূরে ওয়াগন ব্রেকার কালু মল্লিকের রক্তাক্ত নিথর দেহ পড়েছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছু বদলে যায়। ক্রসিং গেটের সামনে ক্রমশ দোকানপাট গড়ে ওঠে, ক্রসিং গেট পরিণত হয় বাজারে। ধীরে ধীরে মালসাও একদিন হারিয়ে যায়। পরে শোনা যায়, লোহা চুরির অপরাধে মালসাকে জেলে চালান দেওয়া হয়েছে এবং সবাই তাকে ভুলে যায়।

আলোচ্য গল্পের মালসা একটি ট্রাজিক চরিত্র। 'মালসা' শব্দের অর্থ মাটির হাড়ি। মাটির হাড়িকে মানুষ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এরপর যখন সেই হাড়ি পুরনো হয়ে যায়, প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় তখন মানুষ সেই হাড়িকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মালসার অবস্থাও ঠিক অনুরূপ। একটা সময় পাড়ার অসমীয়া-বাঙালি সকলের কাছে মালসা ছিল প্রিয় পাত্র। বিভিন্ন কাজে সময়ে-অসময়ে তার ডাক পড়তো। লেখাপড়াও শিখেছিল, এমনকি ইংরেজিতেও বেশ দখল ছিল মালসার। তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যখন মালসা বলে, 'You know, who I?' বাসে দিব্যাংশুর পাশে বসা বাঙালি ভদ্রলোকের কথায় আরও জানা যায়, "মানুহক কাক কি লাগে আরু কেতিয়া—বুঝি ওঠাটোয় টান। এই পাগোলাটোক জানো। ই কিবা এটা পঢ়ি থাকে, মাজে মাজে পকেটর পরা উলিয়াই ইংরেজিত। নিশ্চই পড়াশুনা করিছে এটা সময়ত, কিবা এটা বিচারিছিল, পোয়া নাই।"[৬] [সারমর্ম : মানুষের কাকে কি লাগে এবং কখন লাগে বুঝে ওঠা কঠিন। এই পাগলাটাকে দেখ, সে মাঝে মাঝে পকেট থেকে কিছু একটা বের করে ইংরেজিতে পড়তে থাকে। পাগলটা একটা সময় নিশ্চয় পড়াশোনা করেছিল, কিছু একটা চেয়েছিল কন্তু পায়নি।] পরিস্থিতির চাপে মালসা আজ পাগল। মানুষ আজ তাকে ছঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

ক্রসিং গেটের সামনে আটকে পড়া দিব্যাংশুর পাগল মালসাকে নিয়ে এইসব দৃশ্য দেখতে দেখতে গলদঘর্ম অবস্থা। কারণ তাকে সুনির্দিষ্ট সময়ে সার্কেল অফিসে পৌঁছতে হবে। তা না হলে অসমের নাগরিক হওয়ার অধিকার থেকে তার স্ত্রীকে বঞ্চিত হতে হবে। লেখকের বর্ণনায় বিষয়টি সুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে, "তবে একটা স্বস্তি এই যে, তার কাছে সুনাগরিক হয়ে থাকার মতো উপযুক্ত নথি আছে। ভেরিফিকেশন পেন্ডিং রয়েছে স্ত্রীর, সেটারই ফয়সালা হয়ে যাবার কথা আজ।"[৭] দিব্যাংশুর মনে হয়, এই ঝড়-ঝঞ্ঝাট থেকে মালসা অনেক সুখী। কারণ তার নাগরিক পঞ্জিকরনের কোন বালাই নেই, বালাই নেই কোন কাগজ-পত্র পরীক্ষা করানোর। তাই দিব্যাংশু ভাবে, "মালসার তো কোন এন.আর.সি নেই, বংশবৃক্ষ পরীক্ষা করানোর কোন দরকার নেই, কাগজপত্র নেই। তার পকেটে অযত্নে লালিত যে কাগজগুলো আছে তার কোন দাম নেই।"[৮] শুধু তাই নয়, নথি যাচাই পর্বে বাঙালিকে শুনতে হয়— 'আপনি চৌধুরী, আপনার মিসেস চক্রবর্তী কিয়'। অর্থাৎ আপনি হচ্ছেন চৌধুরী, আপনার স্ত্রী চক্রবর্তী কেমন করে হয়। দিব্যাংশুর মতো বাঙালিরা যারা ব্রহ্মপুত্রের কোলে, এখানকার জল-হাওয়াতে বড় হয়েছে, এখানকার ভাষা-মানুষকে আপন করে নিয়েছে, সেই অসম ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা তারা কল্পনাও করতে পারে না। 'সরাইঘাট'-এর যুদ্ধে (১৬৭১ খ্রি:) আহোম সেনাপতি লাচিত বরফুকনের নেতৃত্বে অসমীয়ারা বিরাট মোঘল সেনাবাহিনীকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেছিল। ঠিক তেমনি ভাবে জনৈক

অসমীয়া রাজনৈতিক নেতা অসম থেকে বাঙালিদের তাড়ানোর জন্য হুংকার দেন সরাইঘাটের শেষ যুদ্ধের। অসমে বাঙালি জীবনের দুঃখ, যন্ত্রণা ও অস্তিত্ব সংকটের কথা বলতে গিয়ে 'শিকড়ের নথিপত্র' গল্পগ্রন্থের মুখবন্ধে দেবাশীষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "ভিন রাজ্যের যেসব মহিলা বিবাহসূত্রে অসমের বাসিন্দা, তাদের পূর্বপুরুষদের ১৯৭১-এর আগের নথির প্রতিলিপি জমা দিয়েছেন পরিবারের মানুষ। কিন্তু অন্য রাজ্য থেকে নথিগুলি পরীক্ষা করে সরকারি দপ্তর থেকে সত্যতার শংসাপত্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই না আসায় প্রচুর মহিলার নাম খসড়া নাগরিক পঞ্জির বাইরে থেকে গেছে। এই সমস্যা শুধু দিব্যাংশুর নয় গল্পে তা জ্ঞাপিত হয়।"[৯]

'লক্ষীর পাঁচালী' গল্পে লেখক জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত অসমের বাঙালি জীবনের সাম্প্রতিকতম যন্ত্রণা তথা রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জিকরণ (এন.আর.সি) রূপায়ণ প্রসঙ্গের বিভিন্ন ছবি তুলে ধরেছেন একজন সুদক্ষ শিল্পীর মতো। বর্তমান সময়ে অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীতে অসমের বাঙালি জাতির এই তীব্র অস্তিত্ব সংকট লেখককে দারুণভাবে নাড়া দেয়। সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ স্বরূপ, তাই সমাজে যা ঘটবে সাহিত্যে তারই প্রতিফলন ঘটবে তা বলাই বাহুল্য। সমাজ-সচেতন লেখক জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত সমাজের এই জ্বলন্ত সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। তিনি এর তীব্র প্রতিবাদে হাতে তুলে নেন কাগজ-কলম। সেই যন্ত্রণা দগ্ধ লেখকের হাত দিয়ে বেরিয়ে আসে 'লক্ষীর পাঁচালী'-র মতো অসাধারণ গল্প।

'লক্ষীর পাঁচালী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র লক্ষী। তাকে কেন্দ্র করেই গল্পটি আবর্তিত হয়েছে। লক্ষী মধ্য-অসমের একজন প্রান্তিক, শ্রমিক ঘরের কন্যা। লক্ষী ভালোবেসে পালিয়ে দেবেন্দ্রকে বিয়ে করে। লক্ষীর স্বামী দিনমজুর, প্যান্ডেলের কাজ করে সংসার চালায়। লক্ষীর কথায় তার স্বামীর পূর্ব ইতিহাস জানা যায়। লক্ষীর শ্বশুর সুধেন্দু মোহনের আদি নিবাস ছিল যমুনামুখ। এর পর সেখান থেকে তারা চলে যায় লঙ্কার রেলওয়ে অঞ্চলে এবং সেখান থেকে নেলির ভেতরে একটি গ্রামে। এই গ্রামে থাকাকালীন এক ভয়ঙ্কর বন্যায় সুধেন্দু মোহনের সমস্ত নথির কাগজ-পত্র ভেসে যায়। এদের কাছে নাগরিকত্ব প্রমাণের আর কোন নথিপত্র অবশিষ্ট থাকে না। পুনরায় নথি তৈরির প্রয়োজনও হয়নি, এমনকি সে সচেতনতাবোধও তাদের ছিল না। এক সময় লক্ষীর ঠাকুরদাদা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীর হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ পরিহাসে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিকের উত্তর প্রজন্ম 'বিদেশী'(এ দেশীয় নয়) নোটিশ পায়। বিদেশী তক্মা পাওয়ার পর দেবেন্দ্র-লক্ষীর স্থান হয় রিলিফ ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে থাকাকালীন লক্ষী ও তার স্বামী জানতে পারে তারা সন্দেহজনক ভোটার অর্থাৎ 'ডি. ভোটার'। লেখকের ভাষায়, "সকাল থেকে লাইন দিয়ে স্কুলের ভিতরে ঢোকার পর সাদা জামা পরা লোকটা জানিয়েছিল কানাইয়ের বাপ আর সে নাকি ডি.ভোটার। নামটা তারা প্রথম শুনেছিল।"[১] পুত্রবধূ লক্ষির মুখে এই কথা শুনে সুধেন্দু মোহন প্রায় হতভম্ব হয়ে যান। তিনি এই সমস্যার সমাধানের জন্য তার 'হাতের পাঁচ' পাঁচটা একশো টাকার নোট লক্ষীর হাতে তুলে দেন। লক্ষি উকিল রবিউলের পাল্লায় পড়ে তার শেষ সম্বল টুকু হারিয়ে ফেলে। দেবেন্দ্রর বন্ধু আলতাফ লক্ষীর কাছে একশো টাকা নিয়ে কিছুটা কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত কেটে পড়ে। রিলিফ ক্যাম্পে থাকা অবস্থায় বাংলাদেশি সন্দেহে দেবেন্দ্রকে গ্রেফতার করে অসম পুলিশ। লক্ষীর কাতর অনুনয়-বিনয় পুলিশের কর্ণগোচর হয়না, জেলে নিয়ে যায় দেবেন্দ্রকে। লেখক অসমের বাঙালির এই যন্ত্রণাকে লক্ষীর মুখ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন, "আমারে কয়, তোরা বাংলাদেশি। যত কই আমার জন্ম উদালিতে, আর হে হইছে যমুনামুখের পোলা, মানেই না। খালি কয়, কাগজ লই আহ।"[১১]

একদিকে ডি.ভোটারের যন্ত্রণা এবং অন্যদিকে ছেলের গ্রেফতার সুধেন্দু মোহনকে মৃত্যুর মুখে পতিত করে। পিতার মুখাগ্নি করতে কিছুটা সময়ের জন্য জেল থেকে ছাড়া পায় দেবেন্দ্র। দেবু যন্ত্রচালিতের মতো বন্ধুর হাত থেকে জ্বলন্ত পাটকাঠি গুলি নিয়ে তিন পাক ঘুরে গুঁজে দেয় পিতার সাজানো কাঠের ফাঁকে। পিতার

জ্বলন্ত চিতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেবেন্দ্রের অন্তর্মনে ঘুরপাক খাওয়া জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেঁচে থাকার লড়াই চিতার জ্বলন্ত আগুনের মতো ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যায়। লেখক জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত এই দৃশ্যের এক মর্মগ্রাহী চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর অসাধারণ লেখনীর গুনে, "তবে আগুনের আভায় তার চোয়ালের ভেতর বসানো হারগুলোকে উদ্ধত হয় উঠতে দেখা যাচ্ছিল, চোখের মণিতে ঝলসে উঠছিল আগুনের শিখা।"[১২] পিতার মুখাগ্নির কাজ শেষে দেবেন্দ্রকে আবার চালান দেওয়া হয় জেলে। এই জেলেই দেবেন্দ্রের এক ট্রাজিক পরিণতি ঘটে। সমস্ত কিছু হারিয়ে এই পৃথিবী তার কাছে শূন্য মনে হয়। দেবেন্দ্র শেষ পর্যন্ত এই দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। অসমের সাম্প্রতিককালে বাঙালির দহন কথার পাশাপাশি দারিদ্র্যের ভয়ঙ্কর ছবিটিও উঠে এসেছে আলোচ্য গল্পের মধ্য দিয়ে। শুধু তাই নয়, উঠে এসেছে অসমের বাঙালিদের প্রতি থানা-পুলিশ-উকিলের নির্মম শোষণ ও অত্যাচারের কথাও।

অসমের বাঙালি সমাজের দুঃখ-দুর্দশার আর এক দলিল 'শিকড়ের নথিপত্র' গল্পগ্রন্থের নাম গল্পটি। এই গল্পে লেখক অসমের এক মধ্যবিত্ত বাঙালির স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বাড়ি তৈরি করার আশা এবং নিরাশা এই দোলাচলতাকে নিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন। শুভ এবং তনু গল্পের দুই প্রধান চরিত্র, এদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এই গল্পটি অগ্রসর হয়েছে। তনু শুভ'র স্ত্রী। তার ইচ্ছে অন্যদের মতো তাদেরও একটি স্থায়ি বাড়ি হোক। ভূষণ করের দুই হাজার টাকার ভাড়াটিয়া রুমে থাকতে তনুর মন আর সায় দেয় না। তাই তনুর উৎসাহে শুভ একলাখ টাকার বিনিময়ে একটি জমিও কিনে ফেলে। কিন্তু জমির দলিল পেতে তার গলদঘর্ম অবস্থা। ডি.সি অফিস থেকে একটি কাঁচা দলিল পেতেই প্রায় দুই হাজার টাকা বেরিয়ে যায়। জমির এই সার্টিফাইট কপিটি পেয়ে শুভ অনেকটা চিন্তামুক্ত হলেও তনুর উৎকণ্ঠা কাটে না। তাই তনুকে শান্ত করার জন্য শুভ বলে, "এতদিন বলতে, আমরা না ঘরকা না ঘাটকা। এবার জায়গা-জমি হয়ে গেল আর তুমি হলে এখানকার জমিদারনি। ভূমিকম্পে তলিয়ে গেলেও ফসিলে এই জায়গার নামটা খোদাই হয়ে যাবে আরও বেশি কিছু যদি চাও তো চলো এফিডেভিট করে টাইটেল বদলে তালুকদার হয়ে যাই।"[১৩]

কিন্তু অসমের বর্তমান পরিস্থিতি এবং চোখের সামনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা বাড়ি তৈরিতে শুভর মনকে সায় দেয় না। ১৯৬০ সালের ভাষা আন্দোলনে যে রায়দা শরিক হয়েছিলেন, সেই রায়দা এবং তার স্ত্রী 'বিদেশি নোটিশ' পায়। আর এই ঘটনা শুভকে অত্যন্ত ব্যথিত করে তোলে। অথচ তার ছেলে-মেয়ে পায় ভারতীয় নাগরিকের তকমা। প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লাহিড়ী পরিবার শুধুমাত্র টাকার বিনিময়ে ভারতের নাগরিক হওয়ার যোগ্যতা পায়। এইসব ঘটনা শুভর রাতের ঘুম কেড়ে নেয়, বাড়িয়ে দেয় রক্তচাপ। তাইতো দুঃখে-হতাশায় শুভকে বলতে শোনা যায়, "এখানকার মাটিতে জন্ম-কর্ম-পড়াশোনা হোক, জমি বা ঘরবাড়ি ইত্যাদি যা-ই থাকুক লোকাল হতে গেলে আরো কিছু কোয়ালিফিকেশন চাই। এটা তো আর পি.আর.সি নয় যে জোগাড় করা যায়।"[১৪] যে অসমে শুভর জন্ম হয়েছে, বড় হয়েছে সেখানেই আজ তারা ক্রমশ অবাঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। কোরাসের ছুঁড়ে ফেলা পোড়া হৃদয়ের টুকরোর মতো অসমের বাঙালিকেও আজ ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। লেখক বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন এভাবে, "এ শহর তার জন্মস্থান হলেও বৃত্তের ভেতরে সে অবাঞ্চিত, বৃত্তের বাইরে সে জন্মেছে, বাইরেই তাকে থাকতে হবে। তার অন্ধকার মনের শিরা-উপশিরাগুলো ক্রমশ ভয়াতুর হয়ে উঠছে.....।"[১৫] শুধু তাই নয়, একটি বাংলা কাগজে অসমের সাম্প্রতিক বাঙালি সমস্যা নিয়ে সম্পাদকের প্রতিবেদন, অসমে বসবাসকারী বাঙালিদের মুখে শোষণ-বঞ্চনার কথা শুনে শুভ অনেকটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা স্তিমিত হয়ে যায়, "তিন দশক ধরে শান্তি হারিয়ে গেছে। স্কুল-কলেজে রবীন্দ্রজয়ন্তী নেই, ১৫-ই আগস্টের উন্মাদনা নেই, এত বছর ধরে আছি লোকাল টিভিতে বাংলা খবর নেই।"[১৬]

অবশেষে শুভ স্ত্রী তনুর উৎসাহে বাড়ি তৈরিতে সম্মত হলেও একটি চাপা কান্নার স্বর তাকে স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনে। পায়েলের দাদুর ক্রন্দন শুভকে অসমের বর্তমান পরিস্থিতি মনে করিয়ে দেয়। এই বৃদ্ধের একমাত্র ছেলে শুধুমাত্র বাঙালি হওয়ার কারণে অসমের 'বাঙালি খেদাও' আন্দোলনের বলি হয়। লেখকের ভাষায়, "রাস্তার ওপার থেকে বন্ধ জানালা টপকে হঠাৎ একটা বুকফাটা হাহাকার এই ঘরে এসে ঢোকে। ভাঙা খনখনে স্বরে কে যেন ডুকরে কেঁদে ওঠে, ও মাঃ...মা-গো...ওরে দীপুরে-এ-এ-এ...।"[১৭] ছেলে দীপুর শোকে বৃদ্ধ শেষপর্যন্ত মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। গল্পের শেষ অনুচ্ছেদে পায়েলের দাদুর দুই হাত চেপে ধরে লম্বা নাক বাইরে বের করা, রজনীগন্ধার ফোটা, সদ্য তৈরি করা সেন বাবুদের ঢালাই করা ছাদ—এইসব চিত্রকল্পই অন্ধকার অসমের বাঙালির অস্তিত্বের অনিবার্য দিকটিকে তুলে ধরেছে।

'প্রাচীর কথা' গল্পে অমরেশের বাড়ির দক্ষিণ দিকে প্রাচীর দেওয়া এবং একমাত্র মেয়ের সত্রীয়া নাচের পোশাক বানানোর টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে গল্পের কাহিনি এগিয়ে গেছে। অম্বরীশ ভট্টাচার্য ১৯৫০ সালে চাকরিসূত্রে অসমে চলে আসে। এখানে ছেলে অমরেশের জন্ম ও বিবাহ। স্বভাবতই অমরেশের ধাত্রী ভাষা অসমীয়া। তার একমাত্র মেয়ে সত্রীয়া নাচ শিখছে এবং তার স্ত্রীও অসমীয়া সাহিত্যের নিয়মিত পাঠক। অমরেশ অসমের একটি কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক। অসমীয়া সংস্কৃতি, ভাষা, খাদ্য—সব কিছুকেই সে নিজের করে নিয়েছে। সর্বোতভাবে অসমের মাটির সন্তান হয়েও অমরেশের ন্যায় বাঙালিদের এখানে পরজীবীর মতো বাস করতে হয়। অসমের বাঙালিদের অস্তিত্বের সংকট, মানুষের ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থা—এই গল্পের মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে। গল্পটির আলোচনা প্রসঙ্গে ড. দেবাশীষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "গল্পে অসমীয়া-বাঙালির আন্তরিক সম্পর্কের টুকরো টুকরো ছবি যদিও রয়েছে, তবে শেষ পর্যন্ত ট্রাগোদিয়ার ছাগল হওয়াই যেন অসমের বাঙালির রাজনৈতিক নিয়তি। গল্পের একটি চরিত্র অসমীয়া সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ কিংবা ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্যের রবীন্দ্রনাথ ও অসমের সম্পর্ক নিয়ে প্রশংসা করেছে ঠিক। কিন্তু জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত অব্যর্থ ইশারায় জানিয়ে দেন, পরজীবী পরিচয় ছেড়ে মাটির সন্তান বলে দাবী করলেই শুরু হবে ট্রাগোদিয়ার উৎসব।"[১৮] এই গল্পে অমরেশের মতো মানুষ বাড়ি তৈরি করলেও প্রতিনিয়ত একটা উদ্বেগ ও আশঙ্কার মধ্য দিয়ে জীবন-যাপন করতে হয়। তাই অমরেশকে বাড়ি তৈরির সময় বাড়ির দেয়াল যতটা সম্ভব ভেতরের দিকে টেনে তুলতে হয়।

'অপেক্ষা' গল্পটিতেও গল্পকার বিভিন্ন রূপক-সংকেতের মধ্য দিয়ে অসমের বাংলা ভাষা ও বাঙালি জীবনের সংকটের চিত্রটি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। ১৯৬১ সালের ১৯শে মে অসমে বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন বরাক উপত্যকার কমলা ভট্টাচার্য। গল্পের শুরুতে নন্দিনী বলেছে, 'আগামি ১৯শে মে আমার জন্মদিন'। ১৯শে মে শুধু নন্দিনীর জন্ম দিন নয়, অসমের বাংলা ভাষা, আত্মত্যাগের জন্মদিন। গল্পকার নন্দিনীর ছবিটি এঁকেছেন লাল ডুরে কিংবা সবুজ বুটিদার তাঁতের শাড়িতে। এই নন্দিনী চরিত্রের কল্পনায় কমলা ভট্টাচার্যের ছায়া পড়েছে। গল্পকার তীব্র প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেছেন, আমরা কি কমলা ভট্টাচার্যের ওরফে নন্দিনীর মতো ভাষা প্রেমের মশাল জ্বালাতে পারি না? আর তা না হলে সেই ইতিহাস বর্গী আক্রমনের মতো শিশুপাঠ্য কাহিনিতে মুখ ঢেকে পড়ে থাকবে। তবে লেখক আশাবাদী, 'আগামী উনিশে মে আমার সঙ্গে রঞ্জনের দেখা হবে' অর্থাৎ অসমের বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।

'ক্যাকটাস অথবা চোরাকুঠুরির আত্মকথা' গল্পেও অসমের বাঙালির প্রতি বৈষম্য মূলক মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এই গল্পটি সোহম নামক এক যুবকের প্রবঞ্চিত হওয়ার ইতিহাস। স্নাতক উত্তীর্ণ হওয়া সোহমের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বাবার ফিক্সট ডিপোজিত থেকে চাকরির জন্য উৎকোচ দিতে হয়। কিন্তু সেই চাকরি সোহম পায়না, এমনকি উৎকোচ দেওয়া টাকাও ফিরে পায় না। কারণ সে প্রচুর বিত্তশালী নয়, প্রভাবশালীদের সঙ্গেও তার কোন যোগাযোগ নেই। সবচেয়ে বড় কথা সে অসমের বাঙালি। তাই পরশু ডেকার

মতো অসমীয়ারা চক্রান্ত করে তাকে চাকরি থেকে বঞ্চিত করে। অপমানিত-ব্যর্থ সোহম এই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে উন্মাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এই গল্পে জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত অসমের বাঙালির শোষিত-বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে সোহমকে তুলে ধরেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত একজন সময় ও সমাজ-সচেতন শিল্পী। তাঁর প্রতিটি গল্প নিজস্ব দেখা ও শোনার জগৎ থেকে সৃষ্ট। জীবন ও জগৎকে তিনি দেখেছেন বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে। শুধু তাই নয়, বিষয় ভাবনা এবং ভাষাশৈলী তাঁর গল্পে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের অন্তর্জগতও সমানভাবে পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর গল্পে। তিনি কখনোই মন মাতানো, ছেলে ভুলানো গল্পে পাঠকের মনোরঞ্জন করেননি। পারিপার্শ্বিক জগতে যা কিছু দেখেছেন এবং অনুভব করেছেন তাকেই তিনি তাঁর ছোটগল্পে রূপ দিয়েছেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অসমে বাঙালিরা প্রতিনিয়ত শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত এবং অত্যাচারিত। এই স্পর্শকাতর বিষয়টিকেই জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত রূপ দিয়েছেন তাঁর গল্পভুবনে। এর পাশাপাশি ভবিষ্যতে অসমের বাঙালিদের অস্তিত্ব কোন পথে চালিত হচ্ছে তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন আলোচ্য গল্পগুলিতে। এদিক থেকে বিচার করলে জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের গল্পগুলি যেন, 'খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার'।

সূত্রনির্দেশ :

১. ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী কর্তৃক ১৯৯৮ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে গৃহীত।
২. দেবাশীষ ভট্টাচার্য, 'শিকড়ের নথিপত্র', (মুখবন্ধ) যাপনকথা, প্রথম প্রকাশ ২০১৯, পৃ. ১৮।
৩. জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, 'শিকড়ের নথিপত্র', যাপনকথা, প্রথম প্রকাশ ২০১৯, পৃ. ১৪৮।
৪. তদেব, পৃ. ১৪৮।
৫. তদেব, পৃ. ১৪৯।
৬. তদেব, পৃ. ১৫৪।
৭. তদেব, পৃ. ১৫১।
৮. তদেব, পৃ. ১৫১।
৯. দেবাশীষ ভট্টাচার্য, 'শিকড়ের নথিপত্র', (মুখবন্ধ) যাপনকথা, প্রথম প্রকাশ ২০১৯, পৃ. ১৬।
১০. জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, 'শিকড়ের নথিপত্র', যাপনকথা, প্রথম প্রকাশ ২০১৯, পৃ. ১৪৪।
১১. তদেব, পৃ. ১৪২।
১২. তদেব, পৃ. ১৪০।
১৩. তদেব, পৃ. ১১২।
১৪. তদেব, পৃ. ১১৬।
১৫. তদেব, পৃ. ১১৮।
১৬. তদেব, পৃ. ১১৫।
১৭. তদেব, পৃ. ১১৯।
১৮. দেবাশীষ ভট্টাচার্য, 'শিকড়ের নথিপত্র', (মুখবন্ধ) যাপনকথা, প্রথম প্রকাশ ২০১৯, পৃ. ৬।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. আকর গ্রন্থ :
ক. সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময়, 'শিকড়ের নথিপত্র', যাপনকথা, প্রথম প্রকাশ ২০১৯। মূল গল্প-
অ. ক্রসিংগেট।

আ. লক্ষীর পাঁচালী।
ই. প্রাচীর কথা।
ঈ. শিকড়ের নথিপত্র।
উ. ক্যাকটাস।
ঊ. অপেক্ষা।

২. সহায়ক গ্রন্থ :

ক. সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময়, 'নারীর কলমে নারী', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৮, কলকাতা।
খ. চৌধুরী, রঞ্জিত, 'বিস্মৃত বলিদান', এই সময়, কলকাতা, মে ২০১৩।
গ. মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ, বাঙালির চেতনায় শুধু একুশে, স্থান নেই উনিশের শহীদদের', এই সময়, কলকাতা, মে ২০১৩।
ঘ. লস্কর, দিলীপ কান্তি, 'উনিশের সংগ্রাম অনন্য, অতুলনীয়', দ্য সানডে ইন্ডিয়ান, মার্চ, ২০১২।